নারী প্রধান কৃষি পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

সাবিহা ইয়াসমিন রোজী[১]
আফসানা ইসলাম[২]
তানিয়া হক[৩]

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তায় গ্রামীণ নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তবে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে অসম অবস্থা বিরাজ করে যা নারীর আর্থ-সামাজিক অর্জনকে ব্যাহত করে। এই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই নারীপ্রধান পরিবারের নারী কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পেরেছে এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ও পুষ্টিমান উন্নয়নে অবদান রাখছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষিতে নারী প্রধান পরিবারের অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। এই গবেষণাটি কর্মজীবী নারী সংগঠনের সহযোগিতায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে মানিকগঞ্জ জেলায় করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষি সম্প্রসারণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারীদের সীমিত পর্যায়ে সম্পৃক্তকরণ এবং এর পাশাপাশি সামাজিক বিধিনিষেধজনিত কারণে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে। নারী প্রধান এসব পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেও পুষ্টিমান রক্ষায় তাঁরা পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে, নারী কৃষকদের বাজারে দৃশ্যমান পদচারণা নেই কারণ পুরুষবেষ্টিত বাজার ব্যবস্থায় বেশিরভাগ পুরুষ নারীদের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করেন। তবে নারীপ্রধান কৃষক পরিবারের নারীদের বৃহত্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে এবং লক্ষণীয়ভাবে তারা আত্মবিশ্বাসী।

মূল-শব্দ: নারী কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীপ্রধান পরিবার, পিতৃতান্ত্রিকতা।

[১]সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[২]সহকারি অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৩]অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল : tania14bd@yahoo.com

১. ভূমিকা

যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী মোট কৃষি শ্রমশক্তির শতকরা ৪৩ শতাংশ নারী এবং বাংলাদেশে এর হার ৫০ শতাংশেরও বেশি। পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় গ্রামীণ নারী কৃষকেরা প্রশংসনীয় অবদান রাখছে (FAO, 2010)। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিতে নারীর অবদানকে অবমূল্যায়ন করা হয়। তাছাড়া সম্পদ ও চাকুরীর ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের কম প্রবেশাধিকার থাকে বিধায় নারীরা কৃষিকাজের মত নিম্ন আয়ের দিকে ঝোঁকে (Buvinic & Gupta, 1997)। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের পাশাপাশি কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির আরও একটি কারণ হচ্ছে নারী কর্তৃত্বাধীন পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। যেখানে পরিবারের পুরুষ সদস্য কাজের জন্য শহরমুখী হচ্ছে বা অন্য কোন কারণে পরিবারকে ছেড়ে যাচ্ছে অথবা মৃত্যুবরণ করছে সেখানে অর্থ উপার্জনের জন্য নারীকেই কাজে যোগ দিতে হচ্ছে, এবং গ্রামীণ এলাকায় নারীর একমাত্র সহজলভ্য কাজ হল কৃষিকাজ (Schutter, 2013)। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পশুসম্পদ উৎপাদন ও কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৯৯৯ সালে জাতীয় কৃষি নীতি বা National Agricultural Policy (NAP) কার্যকর করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বিগত দুই দশক ধরে সামাজিক গোঁড়ামি ও বাঁধাবিপত্তি পেরিয়ে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে নারী কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলছে। তাছাড়া এই নীতিটি ইতিবাচকভাবে নারীদের কৃষিক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টিমান বাড়িয়ে তোলার দিকে গুরুত্বারোপ করে (Rahman & Islam, 2014)। Meguire & Popkin (১৯৯০) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে নারীদের কৃষি উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি পেলে পরিবারের সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। তবে বাংলাদেশে বিদ্যমান সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবাদি নারী কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান বা পুরো বছরের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা সরবরাহ করা হয় না। নারী কৃষকেরা অনেকসময় এই সম্প্রসারণ পরিষেবাদি পায় না, কখনও বা তা নারীদের কাছে সঠিকভাবে পৌছায় না। তাই কৃষিতে নারীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অবকাঠামোগত সহায়তার পাশাপাশি ঋণ সুবিধা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অন্যান্য তথ্য প্রদান করা উচিত।

২. গবেষণা পর্যালোচনা

সমাজ প্রণীত নারী-পুরষের মধ্যকার পার্থক্য কৃষিতে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমন- নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য, নারীর অবদানের নথিগত অস্বীকৃতি এবং গ্রামীণ বাজারব্যবস্থায় নারীর অনুপস্থিতি। আমাদের দেশে নারী কৃষকদের মধ্যে বেচাকেনার জন্য তাদের পণ্য নিয়ে বাজারে যাওয়ার প্রবণতা খুব কম। বাজারে অনুপস্থিতির কারণে নারী কৃষক যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে তা বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু, খাদ্যের গুণগত মানের তুলনায় এর বাজার মূল্য অত্যন্ত কম হওয়ায় তা স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে হয় যা একজন কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন নারী কৃষক তার পণ্য নিয়ে নিজে বাজারে পৌছাতে পারে তখন ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই আয় তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ায় যা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের যোগানে সহায়তা করে, খাদ্যে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে এবং বর্ধিত আয় নারীর ক্ষমতায়নে

সহায়তা করে (Haque, 2012)। সামগ্রিকভাবে, নারী কৃষকদের মোট উৎপাদন পরিবারের খাদ্যের গুণগত মান, খাদ্য গ্রহণের ধরন, এবং পরিমাণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে (Carletto et. al., 2015)। তাছাড়া বর্ধিত কৃষি উৎপাদন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়েছে যা নারী প্রধান পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরসরি প্রভাব ফেলছে। Carletto এবং অন্যান্য (২০১৫) ব্যাখ্যা করেন যে, নিজস্ব কৃষি পণ্য, কৃষিকাজ থেকে আয় সামগ্রিকভাবে নারীদের সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য সুরক্ষা দিতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নারীদের লৈঙ্গিক বৈষম্য বিবেচনা ব্যতিরেকে অধিক পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে আরও সুযোগ প্রদান করে বলে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ সরাসরি নারীদের পুষ্টি এবং খাদ্য সুরক্ষার সাথে সংযুক্ত। তদুপরি, ছোট পরিসরে বাগান করা বা পশু-পাখিপালন নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে এবং খাদ্য, পুষ্টি এবং নগদ আয়ের উপর নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সামগ্রিকভাবে, কৃষিক্ষেত্র এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিভিন্নভাবে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইতিবাচক সূচক হিসাবে সম্পর্কযুক্ত, যা লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করে সমাজে অগ্রগতি এবং পরিবর্তন আনতে পারে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনায় কৃষি সম্প্রসারণে নারীকে মূল সুবিধাভোগী বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিতে নারীর উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও কৃষক ভূমিকার ন্যায্য স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে শুধুমাত্র নারী-প্রধান পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত কিছু সমস্যা নিরসনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা মূলত দুইটি উদ্দেশ্যে আলোকপাত করে: *প্রথমত*, নারী প্রধান পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টিমান রক্ষায় নারী কৃষকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা, এবং *দ্বিতীয়ত*, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।

৪. প্রবন্ধে ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞায়ন

এই গবেষণায় মূলত নারী-প্রধান পরিবার এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যয় দুইটি ব্যবহার করা হয়েছে। নারী কৃষকদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, পরিবার পরিচালনা এবং সমাজ প্রণীত জেন্ডার সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের প্রাপ্তি ও পরবর্তীতে চিহ্নিত কিছু সমস্যার সমাধানের সুপারিশমালা এই বহুমাত্রিক প্রত্যয়গুলোর সাহায্যে আলোচিত হয়েছে।

৪.১ নারী প্রধান পরিবার

বাংলাদেশের পরিবারগুলো সাধারণত পুরুষ-প্রধান হলেও যেসব পরিবারে প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে নারী দায়িত্ব পালন করেন সে সকল পরিবারকেই 'নারী-প্রধান পরিবার' বলা হয় (Buvinic & Gupta, 1997)। ILO (২০০৭: ৮১) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "...Household in which an adult female is the sole or main income producer and decision-maker"। বিভিন্ন কারণে নারী প্রধান পরিবার গঠিত হতে পারে, তবে উক্ত গবেষণা এলাকায় তিনটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়: প্রথমত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ সদস্যের অবর্তমানে নারী পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির দায়িত্ব পালন করেন; দ্বিতীয়ত, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ায় সংসারের

প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে নারী পরিবারের সকল ব্যয়ভার বহন করেন; তৃতীয়ত, পুরুষ সদস্য কর্মসূত্রে অনুপস্থিত থাকায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পারিবারিক নানা কাজে নারীকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংক ও বেসরকারি কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রায় তিন দশক আগে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, শহরের তুলনায় গ্রামে নারী-প্রধান পরিবারের সংখ্যা বেশি এবং কৃষিকাজই ছিল নারীদের জন্য একমাত্র সহজলভ্য কর্মযোগ্য পন্থা। তবে অতিসম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭' প্রতিবেদনে বর্তমানে বাংলাদেশে এই তথ্যের ভিন্নতা পাওয়া গেছে। উক্ত জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ টি পরিবারের মধ্যে ১৪ টি পরিবারের প্রধান এখন নারী এবং গ্রামের তুলনায় শহরে এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা বেশি। যেখানে দশ বছর আগে নারী-প্রধান পরিবারের হার ছিল ১০.৩%, তা বর্তমানে ২০১৩ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান। জরিপে দেখা গেছে, ২০ বছরের কম এমন নারী এখন ২১.৬% এবং অন্যদিকে ৬০-এর মধ্যে বয়স এমন নারী এখন ১৩.৪% যারা পরিবারের মূল উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ৮৪.৮% নারী বিধবা বা স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ায় একাই পরিবারের হাল ধরেছেন।

৪.২ খাদ্য নিরাপত্তা

আলোচ্য প্রবন্ধে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে মূলত খাদ্য প্রাপ্যতা এবং অনাহারে না থাকার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই খাদ্যের নিশ্চয়তা আসতে পারে- উৎপাদিত কৃষিপণ্য হতে, গৃহস্থালি যোগান, বাজার থেকে কেনা বা কারো কাছ থেকে পাওয়া খাদ্য সহায়তা থেকে। খাদ্য নিরাপত্তা হল সময়মত উপযুক্ত খাদ্যের যোগান ও তার যথাযথ জৈবিক প্রয়োগ; পর্যাপ্ত শক্তি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ; বিশুদ্ধ পানীয় জল গ্রহণ ও পরিচ্ছন্নতা অনুধাবন; খাদ্য সঞ্চয় ও প্রক্রিয়াজাতকরণ; প্রাথমিক পুষ্টি ও শিশুযত্ন এবং অসুস্থতা ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ধারণ করা। United Nations's Committee on World Food security এর সংজ্ঞানুযায়ী, "...means that all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutrious food that meets their food preferences and dietry needs for an active and healthy life" (FAO, 2012: 04)।

এটি কেবল স্বাস্থ্যগত ইস্যু নয় বরং এর সঙ্গে কৃষি উৎপাদন, নারীর ক্ষমতায়নসহ পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যও সম্পর্কিত। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক এলাকায় নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ ছাড়া সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা কখনোই সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন 'ফুড এনটাইটেলমেন্ট' ধারণার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্ভিক্ষবিষয়ক গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে। অর্থনীতিবিদ এবং গবেষক রুহিনা ফেরদৌস (n.d.) তার এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন: এই অর্থনৈতিক ধারণাটি বস্তুত চারটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: ১) উৎপাদনভিত্তিক উপাদান, যা উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকানার ওপর নির্ভর করে; ২) বাণিজ্য নির্ভর উপাদান, যেটি খাদ্যের বাজারের ওপর নির্ভরশীল; ৩) স্ব-শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব, যা উৎপাদন ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শ্রমশক্তির সুযোগ ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে এবং ৪) উত্তরাধিকার ও ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর, যা সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত ত্রাণ ও ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য শুধু উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, সব জনগণের খাদ্যের ওপর নিজেদের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে তাদের সেই খাদ্যের ওপর অধিকার অর্জন অপরিহার্য।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মানিকগঞ্জ জেলাকে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। নারী-প্রধান কৃষক পরিবার চিহ্নিত করতে কর্মজীবী নারী নামক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়া হয়েছে। কর্মজীবী নারী উক্ত এলাকায় নারীদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। নারী কৃষকদের প্রাথমিক বাছাইকরণের পর মাঠপর্যায়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে ২৫ জন নারী ও পুরুষ কৃষক, কম্যুনিটির প্রতিনিধি, নেতা ও নীতি নির্ধারকদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও দুইটি দলগত আলোচনা করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি এবং বাজার ব্যবস্থায় তাঁদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনামূলক ধারণা লাভ করা। এছাড়া এই গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন- ছদ্মনাম ব্যবহার করা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা, সাক্ষাৎকার দাতার গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তথ্যের সঠিক ব্যবহার করা।

৬. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল মূলত তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এবং তাঁদের মধ্যকার বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্কের ওপর নারী কৃষকের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা কতটা নির্ভরশীল তা প্রকাশ করে। *প্রথমত*, নারী কৃষকদের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তাজনিত অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। *দ্বিতীয়ত*, খাদ্য নিরাপত্তা অনেকখানি নিশ্চিত হলেও পুষ্টি রক্ষায় নারী কৃষকদের বেশ বেগ পেতে হয় এবং পরিবারে পুষ্টিমান রক্ষায় তাঁরা এখনো পিছিয়ে আছে। *তৃতীয়ত*, প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতি নারীদের কৃষিতে ও বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে এবং কৃষি সম্প্রসারণ সুবিধা গ্রহণে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিমান রক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া নারী কৃষকেরা শুধু সামাজিকভাবে হেয়- প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন তাই নয়, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া এবং মূল আয় কমে যাওয়ায় তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাঘাত ঘটে।

৬.১ নারী কৃষক পরিবার এবং খাদ্য নিরাপত্তা

এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, দরিদ্র পরিবারের নারী কৃষকেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। দরিদ্রতার সাথে খাদ্য সংক্রান্ত অনিরাপত্তার একটি গভীর যোগাযোগ থাকায় এবং নারী কৃষকদের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা বুঝার সুবিধার্থে, এই গবেষণায় অতীত এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের গবেষণায় প্রায় ৩০ বছর আগের খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা ফুটে উঠেছে নারী কৃষকদের জবানীতে। একজন নারী কৃষক তাঁর দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

> ৩০ বছর আগে আমি অন্যের ক্ষেতে কাজ করতাম, কিন্তু খুব কম উপার্জন করতাম। আমি একটি বাড়িতেও কাজ করতাম দু'বেলা ভাতের বিনিময়ে। আমি সেই ভাত

> আমার সন্তানদের খাওয়াতাম আর নিজে একদম অল্প খেতাম। আমি আমার পেটিকোট শক্ত করে বেঁধে নিতাম আর প্রচুর পানি খেতাম যেন আমার ক্ষিধে না লাগে। এই কষ্ট কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এখন আমি তিন বেলা পেট ভরে ভাত খেতে পারি, আর নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হয়। (রাহেলা, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী)

রাহেলার মতো আরও অনেকেই আছেন যারা গত কয়েক বছরে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রেখে চলেছেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সব নারীরা তাঁদের অর্জিত আয় দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাই কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত কৌশল শুধুমাত্র দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখে তাই নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় খাদ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান, যার কারণে নারীরা পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন সময় নারী কৃষকদের পরিবারে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব খাদ্যের অসম বণ্টনে অধিক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া নারীদের জন্য নিম্ন মজুরি এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা তাদেরকে সম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ হতে বিরত রাখে, যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে একটি প্রতিবন্ধক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই যেখানে মূল লক্ষ্য, সেখানে সুষম পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেয়া অসাধ্যই বটে। কিন্তু Sraboni et al. (2014) এর মতামত অনুসারে, কৃষি- সম্পর্কিত সম্পদ এবং কৃষি হতে প্রাপ্ত আয়ের ওপর নারীদের বর্ধিত দখল পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যের বণ্টন ও পুষ্টি রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণাটি উক্ত চিন্তার সাথে শুধু সহমত প্রকাশ করে তাই নয়, বরং নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিশ্বাস করে।

৬.২ নারী কৃষক পরিবার এবং পুষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা

UNICEF (2012) এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে অপুষ্টির প্রধান কারণ হলো পর্যাপ্ত খাদ্য কিনতে পারার অসামর্থ্য, নিম্ন মানের মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ভিটামিন এ, আয়রন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং অন্যান্য খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাদ্যের অভাব। বিভিন্ন দেশে মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত সমস্যা বেশি লক্ষ করা যায়, যা পরবর্তীতে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই শিশুরা শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে বেড়ে উঠে, যা তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় UNICEF (2012)। এই সমস্যা সমাধানে Sraboni et. al., (2014) এর গবেষণাটি বেশ সহায়ক, কেননা তাঁরা মনে করেন মায়ের কৃষিকাজে অংশগ্রহণ এবং পরিবারে উন্নত পুষ্টির মান নিশ্চিতকরণ একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত মায়েরা তাঁদের আয়ের একটি বড় অংশ পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করে থাকেন। যদিও নারী-প্রধান পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বেশ কঠিন, সেখানে সুষম পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাই এই গবেষণায় নারী প্রধান পরিবারে পুষ্টির নিম্নমান পরিলক্ষিত হয়েছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে জানা গেছে যে, নারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, এবং কৃষি জমির মালিকানা থাকার কারণে খাদ্যবণ্টনে পরিবর্তন এসেছে। তবে যেহেতু বাংলাদেশে সামাজিক নিয়ম এবং সংস্কৃতির প্রভাবে খাদ্যবণ্টন ও ভোগের বেলায় পুরুষরা প্রাধান্য পায়, মানিকগঞ্জেও ঠিক একই ধরনের ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়। নারী প্রধান কৃষক পরিবারে পুরুষ কর্তার

অনুপস্থিতিতে শিশুরা খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় এবং দৈনন্দিন খাবারের একটা বড় অংশ তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকে। কৃষক নারীরা সারাদিন মাঠে এবং ঘরে কাজ করে থাকেন, তবুও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের বেলায় তাঁদের পশ্চাৎপদতা কিছু বিষয়কে সামনে তুলে নিয়ে আসে। *প্রথমত*, পুষ্টি সম্পর্কে নারী কৃষকদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব। বেশিরভাগ নারী আমাদের জানিয়েছেন তাঁরা কোন ধরনের সরকারি বা বেসরকারি খাত থেকে পুষ্টি সংক্রান্ত কোন ধরণের নির্দেশনা বা প্রশিক্ষণ পাননি। তাছাড়া পুষ্টিকর খাবার উৎপাদন, শনাক্তকরণ, এবং প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত তথ্যের অভাবও লক্ষ করা গেছে। বেশিরভাগ মানুষের 'পুষ্টি' শব্দটির সাথে পরিচয় ঘটেছে টেলিভিশন দ্বারা, কিন্তু এর ব্যাপকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব সামগ্রিক পুষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই কৃষকেরা মনে করছেন যে, তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার যোগান দেওয়া বেশ ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। তবে তার মানে এই নয় যে, পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অনাগ্রহ রয়েছে। একজন নারী কৃষক বলেছেন "আমি মনে করি আমার ক্ষেতের সব্জিই আমার পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে। আমরা গরিব মানুষ। প্রতিদিন মাছ মাংস পাবো কোথায়?" অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি রক্ষায় কৃষকেরা বাড়ির আঙ্গিনায় করা বাগান ও ক্ষেত থেকে প্রাপ্ত শাক-সব্জির ব্যবহার করে থাকেন, যা সুষম পুষ্টির যোগান দিতে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষক পরিবারগুলো অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জনের আশায় মূল উৎপাদনের বেশিরভাগ অংশ বিক্রয় করে ফেলে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত ভাল শাক-সব্জি বা অন্যান্য ফসলগুলো বাজারে বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের ভাষ্যমত অনুযায়ী, কিছুটা পচে যাওয়া, ঠিক ভাবে বেড়ে না উঠা এবড়োথেবড়ো আকৃতির এবং রোগাক্রান্ত সব্জিগুলো নিজেদের জন্য রেখে দেয়া হয়। এর কারণে শুধুমাত্র পুষ্টির অভাবই তৈরি হয় না, বরং দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। *তৃতীয়ত*, এই পরিবারগুলোতে দরিদ্রতার জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব লক্ষ করা যায়। এই গবেষণায় দেখায় যায়, বেশিরভাগ পরিবারে সপ্তাহে এক/দুই দিন মাছ রান্না হয়ে থাকে, আর কোন কোন পরিবারে মাসে একদিন মাংস রান্না হয়। কিছু পরিবার হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে বিধায় তুলনামূলকভাবে ডিমের যোগান বেশি দিতে পারে। অন্তত মাসে একবার দুধের বন্দোবস্ত করা হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থা খাদ্য তালিকা নির্ধারণে এবং পুষ্টিমান নিয়ন্ত্রণে একটি প্রয়োজনীয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া (Van de Bold et. al. 2015: 232) তাঁদের গবেষণায় বলেছেন একটি পরিবারের পুষ্টিমান কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন "poor sanitation, agriculture-related diseases, women's disempowerment, and inadequate quality of health services"। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা বাস্তবায়নের ঘাটতি, সমন্বয়ের অভাব, এবং জবাবদিহিতার অভাব সার্বিক পুষ্টি সংক্রান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। তাই নারী প্রধান পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও পুষ্টিকর খাবারের অপর্যাপ্ততা তীব্র মাত্রায় লক্ষণীয়।

৬.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পুষ্টি নিশ্চিতকরণে নারী কৃষকদের জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

কৃষি নারীর জীবিকা নির্বাহে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে এবং কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণের হার ৬৪.৮৪%, যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণের হার ৪০.১৮% (Hossain & Bayes, 2010)। উন্নয়নশীল দেশে নারী কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক অবদান থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিবেচনায় তাঁরা এখনো দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলায় নারী কৃষকেরা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান রক্ষায় যে ধরণের সমস্যা গুলোর সম্মুখীন হয়েছেন বা এখনো হচ্ছেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

ক সামাজিক বাঁধা

সামাজিক বিবিধ নিয়ম নীতি, যেমন- পর্দা প্রথা এবং বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ নারীদের বাইরের জগত থেকে আলাদা করে রাখে (Kashem & Islam, 1999)। এ কারণে নারীর বাইরের জগতে অংশগ্রহণ এবং প্রচলিত প্রথার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার প্রচেষ্টা তাঁদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে। মানিকগঞ্জ জেলার নারী কৃষকেরা সামাজিকভাবে বিভিন্ন রকম কটূক্তির শিকার হয়েছেন; বিশেষ করে ২০ বছর আগে যখন তাঁরা মাঠে কাজ করতে শুরু করেন, তাদেরকে 'খারাপ মহিলা' বলে ডাকা হতো। গ্রামের লোকজন তাঁদের নিয়ে সমালোচনা করত, এবং তাঁদেরকে "বেশরম" আখ্যা দিয়ে 'নম্র-ভদ্র' নারীদের জন্য এক ধরনের হুমকি হিসেবে গণ্য করা হতো। শুরুর দিকে এই নারীরা চুপ করে থাকতেন অথবা নিজেকে নিয়ে লজ্জায় ভোগতেন। তাঁরা পুরুষদের সামনে খেতে লজ্জা পেতেন, আর তাই সারাদিন মাঠে না খেয়ে কাজ করতেন। তাছাড়া মাঠে কোন পায়খানা না থাকায় শারীরিক ভাবে কষ্ট পেতেন। যদিও সময়ের সাথে সাথে তাঁরা মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়েছেন এবং প্রতিবাদ করতে শিখেছেন, তবুও কৃষক হিসেবে এখনো তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া প্রচলিত সামাজিক প্রথানুযায়ী এখনো নারীর সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় বিধায় নারী কৃষকের ক্ষেতে কাজ করা বা বাজারে ফসল বিক্রয় করাকে উৎসাহিত করা হয় না।

খ নারীদের বাজারব্যবস্থায় অংশগ্রহণ এবং তথাকথিত বৈষম্যমূলক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ

মানিকগঞ্জ জেলায় নারীদের কৃষিতে অংশগ্রহণের হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ম বাজার ব্যবস্থায় তাঁদের অংশগ্রহণে বাঁধা দেয়, বিশেষ করে যুবতী নারীদেরকে। পুরো বিশ্ব জুড়ে নারীদের বাজারব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় মূলত আয়ের ওপর দখল থাকার জন্য (Kristjanson et al. 2014)। নারী-প্রধান পরিবারে এই সমস্যাটি দৃশ্যত অপ্রাসঙ্গিক যেহেতু নারীরা নিজেদের উপার্জন কিভাবে খরচ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়ে থাকেন। তবে অনেক সময় কৃষিপণ্য বাজারে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রতিবেশী পুরুষদের ওপর নির্ভরশীলতা তাঁদের ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে। ফলে সর্বোপরি মূল আয় কমে যায়। এ ব্যাপারে মরিয়ম বলেন-

> যদিও আমি মাঠে কাজ করি, তবুও একজন মহিলা বাজারে তাঁর পণ্য নিয়ে যাবে এটা ভালো দেখায় না। আমার পরিবারে কোন পুরুষ সদস্য নেই, তাই আমি আমার প্রতিবেশীদেরকে আমার পণ্যগুলো দেই বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। তাঁরা আমার অনেক উপকার করে থাকেন। আর যদি কেউ আমার ফসল বা সব্জি বিক্রি করে না দেয়, ওগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

তবে আরো অনেক নারী কৃষক আছেন যারা নিজেরাই বাজারে তাঁদের পণ্য নিয়ে যান। শুরুর দিকে, মানুষ তাঁদের নিয়ে শুধু সমালোচনা করেছে তাই নয়, বরং বসার জায়গা পর্যন্ত দেয়া হয়নি। ক্রেতারা বিভিন্ন সময় তাঁদের ধোঁকা দিতে চাইতো, বা ন্যায্যমূল্য দিতে চাইতো না। প্রাথমিক অবস্থায় লজ্জায় তাঁরা কিছু বলতেন না। এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তবে বাজারে এখনো নারীদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়।

মানিকগঞ্জ জেলায় সরকারের কৃষি সম্প্রসারণমূলক কর্মকর্তাদের নারী কৃষকদের বাজারমুখি করার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোহিতা এবং আগ্রহের ঘাটতি লক্ষণীয়। ঠিক একইভাবে, মানিকগঞ্জের চেম্বার অব কমার্স এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নারীদের বাজারে অংশগ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে কোন ধরনের

ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কমিটিতে ৫০০ জন পুরুষ সদস্যের বিপরীতে মাত্র ১০ জন নারী সদস্য আছেন। সুতরাং এই কমিটি থেকে ভবিষ্যতে নারীবান্ধব বাজার গঠনে কোন ধরনের উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা তা অনিশ্চিত। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে বয়স্ক পুরুষরা নারীদের বাজারে অংশগ্রহণ করার বিরোধিতা করেছেন। একজন পুরুষ তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন যে "আমার স্ত্রী যদি বাজারে যাওয়া শুরু করে, তাহলে আমাকে আর সম্মান করবে না, বা আমার কথা মত চলাফেরা করবে না। এসব কারণে পারিবারিক সমস্যা তৈরি হবে"। সুতরাং নারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ইচ্ছা থেকে তাঁদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশে বাঁধা দেয়া হয়ে থাকে।

নারী কৃষকেরা বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্বকেও তাঁদের সঠিক উপার্জনের ক্ষেত্রে একটি বাঁধা হিসেবে মনে করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পণ্যের ওজন বেশি হওয়ায় ভ্যান গাড়িতে করে বাজারে নিয়ে যেতে হয়, যা আয়ের তুলনায় ব্যয়বহুল। তাই নারীদের বাজারে অংশগ্রহণের হার খুবই কম। তাছাড়া নারীপ্রধান পরিবার হওয়া সত্ত্বেও যুবতী নারীদের বাজারে পাঠানো হয় না। যেহেতু সামাজিকভাবে নারীদের বাজারে অংশগ্রহণকে ভালোভাবে দেখা হয় না, অল্পবয়সী নারীদের বাজারে পাঠাতে পরিবারের সদস্যরা সংকোচবোধ করেন। বয়স্ক নারীরা মনে করেন কোন ধরনের উপায় না থাকায় তাদেরকে বাজারমুখি হতে হয়েছে, কিন্তু তাঁদের পরিবারের অন্য নারীদের বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথা সত্যি যে, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের কারণেই এই সব নারীরা সামাজিক বিধি নিষেধের শৃঙ্খল ভেঙেছেন (Jaim & Rahman, 1988); তবুও পুরোপুরি এই বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই বাজারে অংশগ্রহণে নারীদের কম আগ্রহী হতে দেখা যায়, যা তাঁদের উপার্জন তথা পারিবারিক পুষ্টির মান নিয়ন্ত্রণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

গ. কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাব

নারী কৃষকদের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ লক্ষ করা গেছে। নারী কৃষকদের কাছে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছানোর হার কম। ফসল উৎপাদন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ফসলের রোগ প্রতিরোধ, বা শস্যবীজ সংরক্ষণ সম্পর্কে নারী কৃষকদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাছাড়া যেসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, তা যদি মানিকগঞ্জ জেলার বাইরে হয়, বেশির ভাগ নারী তাঁদের ঘরে এবং মাঠে দ্বৈত ভূমিকার জন্য অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। গবেষণার ফলাফল হতে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, কিছু কিছু কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নারী কৃষকদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন, এবং তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তিসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন নারী কর্মকর্তা না থাকায় নারী কৃষকেরা পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন না বলে দাবি করেন। তদুপরি, এই নারীগণ কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন, তবুও তাঁদের আশানুরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুষ্টিমান উন্নয়নে জেন্ডার-সংবেদনশীল কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা জরুরি।

৭. পর্যালোচনা

এই গবেষণার দ্বারা নারী-প্রধান পরিবার এবং তার নিমিত্তে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূলত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারী কৃষকদের পরিবর্তিত অবস্থান এবং পুষ্টিমান রক্ষায় বিদ্যমান সমস্যার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা ফলাফল থেকে বুঝা যায় যে, নারী-প্রধান কৃষি পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং

পরিবারের সদস্যরা তিন বেলা খাদ্যের সংস্থান করতে সক্ষম। তবে পুষ্টিমান রক্ষায় তাঁরা পিছিয়ে আছে, এবং বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা পারিবারিক পুষ্টি সংক্রান্ত অবস্থানকে প্রভাবিত করে। Ahmed (1992: 385) কৃষক হিসেবে নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে বলেছেন- "production are controlled by sexual division of labor, access to land or other production resources (livestock and tools), the crop types and crop growth (technology and access to labor), and women's control over what is produced (marketing and distribution)"। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনে ভূমির মালিকানা বা অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত সম্পদ ব্যবহারের অসুবিধা, এবং উৎপাদিত পণ্যের উপর নিজস্ব দখল না থাকা নারীদের কৃষক হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করে। এছাড়া আমাদের গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, নারীদের প্রতি প্রচলিত বৈষম্যমূলক আচরণ, কটূক্তি, এবং কৃষক হিসেবে সম-সুবিধা না পাওয়া নারী কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং এই গবেষণাপত্রটি কৃষিতে নারীর অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক অবদানের গুরুত্ব বুঝাতে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি রক্ষায় তাঁদের পরতিবর্তিত অবস্থানের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়েছে।

নারী কৃষকের অবদান কৃষিতে এখনো স্বীকৃতি পাবার অপেক্ষায় (Malapit and Quisumbing, 2015); তবে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতিমালা কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদানের প্রশংসা করে, এবং CEDAW (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979) তে নারী কৃষকদের জন্য বলা আছে "right to receive training, education and extension services, as well as equal access to credit and marketing facilities, and equal treatment in agrarian reform" (Razavi & Miller, 1995: 6)। তথাপি, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, নারী কৃষকেরা বরাবরই বিভিন্ন সুবিধা আদায়ে যেমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ, মূলধনের সহজলভ্যতা, জমির মালিকানা, এবং বাজারে সমান অংশগ্রহণে পিছিয়ে আছে। আমাদের প্রাপ্ত ফলাফলে আমরা দেখেছি যে, চেম্বার অব কমার্সে বা কৃষি অফিসে শুধুমাত্র পুরুষেরা উচ্চ পদে আসীন। এই কারণে নারীরা কোন অফিসে গিয়ে সেবা চাইতে অস্বস্তিবোধ করে। তাছাড়া তাঁরা অন্য আরও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যেমন- সামাজিক কটূক্তি, লাঞ্ছনা, অর্থের অভাব, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির অভাব। উপরন্তু, বাজারে সমান অংশগ্রহণ এখনো বেশ কঠিন, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সুষম পুষ্টি আনয়নে প্রতিকূলতা তৈরি করে।

অন্যদিকে, এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারী কৃষকদের মধ্যে আশাব্যঞ্জকভাবে আত্মবিশ্বাস বেঁড়ে গেছে, তাঁদের পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, যেসব নারীরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাঁরা উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবারের পুষ্টিমান উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখেন। মূলত কৃষি এবং পুষ্টির সমন্বয় নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র প্রকাশ করে যা প্রচলিত বৈষম্যমূলক আচার-আচরণে পরিবর্তন আনতেও সহায়তা করে। তবে এই গবেষণাপত্রটি বিদ্যমান নীতিমালা পরিমার্জন করে তাতে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের উপর নজর দিতে সুপারিশ জানায়-১। কমিউনিটি পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্ব বৃদ্ধিকরণ, ২। সম্পদ এবং আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করা এবং তার উপর নিজের দখল বজায় রাখা, এবং ৩। বাজার ব্যবস্থায় সমান অংশগ্রহণ। এর মাধ্যমে নারীদের শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, প্রাপ্ত উপার্জন কিভাবে এবং কোথায় খরচ হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে পারা, এবং কমিউনিটি পর্যায়ে তাঁদের নেতৃত্ব দান করতে পারার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৮. উপসংহার এবং সুপারিশমালা

পিতৃতান্ত্রিক মানিকগঞ্জ জেলায় নারী এবং পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুন প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে নারী এবং পুরুষদের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায় যা নারীদের জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যদিও মানিকগঞ্জ জেলার নারী কৃষকেরা দীর্ঘ সংগ্রাম দ্বারা তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন করেছেন, তবুও এখনো তাঁদের সমালোচনার শিকার হতে হয়। এখনো তাঁরা কৃষক হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি পাননি, এখনো তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাজারে যাওয়া নিয়ে সংকীর্ণতায় ভোগেন। নারী কৃষকের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ সেবার অংশ হিসেবে তথ্য, প্রশিক্ষণ, এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সেবা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা থাকায় অনেক নারী মাঠে ফসল ফলানোর চেয়ে বাড়িতে পশুপালন বা বাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি চাষে বেশি আগ্রহী। তবে পুরুষ সদস্যের অভাব থাকায় নারীপ্রধান পরিবারের নারীদের নিজেরা মাঠে গিয়ে ফসল ফলানোর অন্য কোন বিকল্প নেই, কেননা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করে। এছাড়া কৃষিতে অংশগ্রহণ তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টি রক্ষায় অবদান রাখে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে অনুমেয় যে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে নারীদের কৃষিতে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ধীরে ধীরে পুষ্টিমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আমাদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশমালা নিম্নে বর্ণিত হলো-

১। নারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের নিয়োগ প্রদান দ্বারা নারী কৃষকদের কাছে সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে ফসলের মাঠ ভ্রমণ এবং নারী কৃষকদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার আওতায় নারী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, এবং বিনামূল্যে সার, বীজ, ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। নারী কৃষকদের মূলধন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য সহজ সুদে ঋণ প্রদান এবং এই তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

৫। নারী কৃষকদের চেম্বার অব কমার্সে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে করে বাজারব্যবস্থাকে নারী বান্ধব করা যায় এবং তাঁদের জন্য আলাদা বসার জায়গা, নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রির সুযোগ, অভিযোগ (যদি থাকে) গ্রহণ এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে কৃষক পরিবার ধারণা পায় এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারে আগ্রহী হয়।

৭। পরিবারের পুষ্টিমান উন্নয়নে পুরুষদের ভূমিকাকে ছোট করে না দেখে তাঁদেরকে ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এছাড়া নারীদের বাজার গমন বা মাঠে কাজ করা নিয়ে যে প্রচলিত মানসিকতা তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান, তা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৮। পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রচার চালাতে হবে যাতে করে সবাই সচেতন হয়। এলাকার বিভিন্ন স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন, বা পোস্টার টাঙ্গানোর পাশাপাশি টেলিভিশন, এবং রেডিও তে বিজ্ঞাপন বা নাটিকা সম্প্রচারের আয়োজন করা যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা: আলোচ্য গবেষণাটি আন্তর্জাতিক সংস্থা The United States Agency for International Development (USAID) এবং The United States Government Feed the Future প্রকল্পের অর্থায়নে "Integrating Gender and Nutrition within Extension and Advisory Services" এর সার্বিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে .

গ্রন্থপঞ্জি

ফেরদৌস, রুহিনা (n.d.) *খাদ্য নিরাপত্তা: আমরা কি সঠিক পথে চলছি?* Institure for Inclusive Finance and Development (InM). Retrived from Dhaka http://inm.org.bd/%E0%A6%96%BE%E0%A6%E0%17~BF-%EO%A6%B8

Ahmed, M. R. (1992). Unseen workers: A sociocultural profile of women in Bangladesh agriculture. *Society & Natural Resources, 5*(4), 375-390. doi:10.1080/08941929209380800

Buvinic, M., & Gupta, G. R. (1997). Female-Headed Households and Female-Maintained Families: Are They Worth Targeting to Reduce Poverty in Developing Countries? *Economic Development and Cultural Change, 45*(2), 259-280

Carletto, G., Ruel, M., Winters, P., &Zezza, A. (2015). Does better agriculture mean better nutrition? Retrieved from http://a4nh.cgiar.org/2015/10/01/does-better-agriculture-mean-better-nutrition/

FAO. (2010b). *Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty Status, trends and gaps*. Retrieved from Rome: http://www.fao.org/docrep/013/i1638e/i1638e.pdf

FAO. (2012). *Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition*. Retrieved from Rome, Italy: http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf

Haque, J. T. (2012). *Agrarian Transition and Livelihoods Of the Rural Poor: Agriculture Extension Services*. Retrieved from Dhaka: http://www.unnayanprg/reports/agri/AgricultureBxt.pdf.

Hossain, M., & Bayes, A. (2010). *Rural Economy and Livelihoods*. Dhaka: A.H.L. Development Publishing House.

International Labour Organization – ILO (2007). ABC of Women Workers' Rights

and Gender Equality. Retrieved on 31 July 2016 from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreport/gender/documents.

Jaim, W. M. H., & Rahman, M. L. (1988). Participation of women and children in agricultural activities: a micro level study in an area of Bangladesh. *Bangladesh Journal of Agricultural Economics, 11*(1). p.31-50.

Kashem, M. A., & Islam, M. M. (1999). Use of Indigenous Agricultural Technologies by the Rural Men and Women Farmers in Bangladesh. *Journal of Sustainable Agriculture, 14*(2-3), 27-43. doi:10.1300/J064v14n02_05

Kristjanson, P., Waters-Bayer, A., Johnson, N., Tipilda, A., Njuki, J., Baltenweck, I. MacMillan, S. (2014). Livestock and women's livelihoods. In A.R. Quisumbing, (Eds) *Gender in Agriculture: Closing the knowledge gap* (pp. 209-233). Dordrecht: Springer Netherlands.

Malapit, H. J. L., & Quisumbing, A. R. (2015). What dimensions of women's empowerment in agriculture matter for nutrition in Ghana? *Food Policy, 52*, 54-63. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.02.003

McGuire, J., & Popkin, B. M. (1990). Beating the zero sum game: women and nutrition in thethird world. *Food and Nutrition Bulletin, 11*(4), 38-63.

Rahman, K., & Islam, M. (2014). Nutrition-sensitive agriculture in Bangladesh: a review. *The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food, 6*(5), 671-683. doi:10.1007/s12571-014-0380-2

Rahman, K., & Islam, M. (2014). Nutrition-sensitive agriculture in Bangladesh: a review. *The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food, 6*(5), 671-683. doi:10.1007/s12571-014-0380-2

Razavi, S., & Miller, C. (1995). *From WID to GAD: Conceptual shifts in the women and development discourse* (Vol. 1). UNRISD occasional paper.

Schutter, O. d. (2013). *The agrarian transition and the 'feminization' of agriculture.* Paper presented at the International Conference on Food Sovereignty: A Critical Dialogue, Yale University. https://www.tni.org/files/ownload/37_deschutter_2013.pdf

Sheuli, S. A. (2013). Feminization of Bangladesh's agriculture. Retrieved from http://asia.ifad.org/web/bangladesh/home/-/news/7929/newsletter

Sraboni. E.,Malapit, H. J., Quisumbing, A. R., & Ahmed, A. U. (2014). Women's Empowerment in Agriculture: What Role for Food Security in Bangladesh? *World development, 61*, 11-52. doi:10.1016/j.worlddev. 2014.03.025

UNICEF. (2010). *Narrowing the gaps to meet the goals*: UNICEF.

van den Bold, M., Kohli, N., Gillespie, S., Zuberi, S., Rajeesh, S., & Chakraborty, B. (2015). Is There an Enabling Environment for Nutrition-Sensitive Agriculture in South Asia? Stakeholder Perspectives from India, Bangladesh, and Pakistan. *Food and Nutrition Bulletin, 36*(2), 231-247. doi:10.1177/0379572115587494